পাহাড়ে চড়ার মিলকথা সাহস

তনুকা ভৌমিক

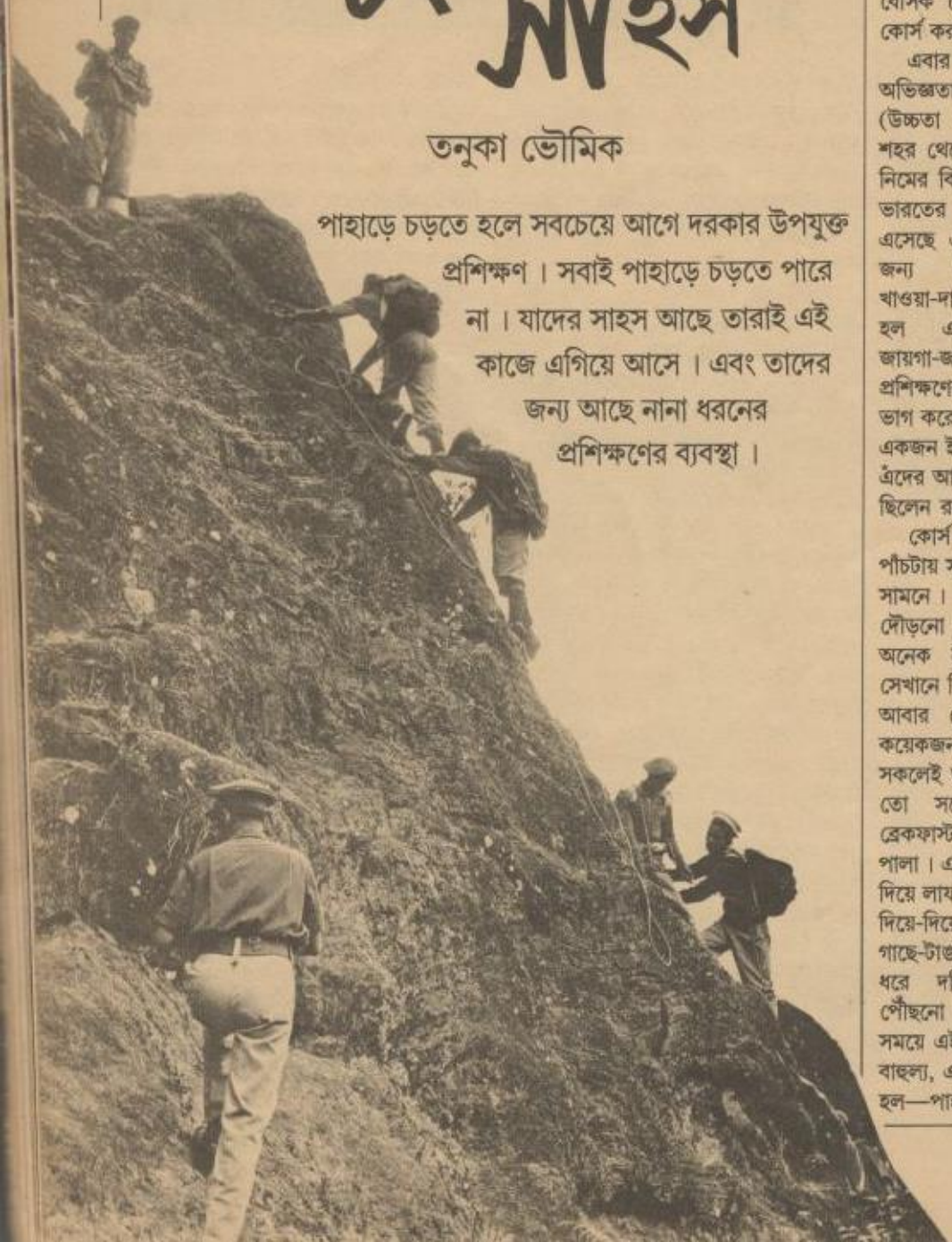

পাহাড়ে চড়তে হলে সবচেয়ে আগে দরকার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। সবাই পাহাড়ে চড়তে পারে না। যাদের সাহস আছে তারাই এই কাজে এগিয়ে আসে। এবং তাদের জন্য আছে নানা ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

পাহাড়ে চড়া শিখতে হলে সবচেয়ে আগে কোনও রক ক্লাইম্বিং কোর্স করে নেওয়া ভাল। পশ্চিমবঙ্গের শুশুনিয়াসহ নানা জায়গায় চার-পাঁচ দিনের এ-জাতীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই কোর্স করা থাকুক বা না থাকুক, পর্বতারোহী বা ক্লাইম্বার হতে হলে 'বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স' করতেই হবে। দার্জিলিং-এর হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন (এইচ এম এ) বা উত্তরকাশীতে নেহরু ইনস্টিটিউট অব মাউন্টেনিয়ারিং (নিম)-এ এই ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নিম-এ ছেলে-মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা বেসিক কোর্সের ব্যবস্থা আছে। আমি এই কোর্স করতে যাই ১৯৮৫ সালের মে মাসে।

এবার বেসিক কোর্সে আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছি। ট্রেনে উত্তরকাশী (উচ্চতা ১১৬০ মিটার) পৌঁছে, উত্তরকাশী শহর থেকে অনেক উঁচুতে পাহাড়ের মাথায় নিমের বিরাট বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে মেয়েরা এসেছে এই কোর্স করতে, তাদের থাকার জন্য ডরমিটরির ব্যবস্থা রয়েছে, খাওয়া-দাওয়ার জন্য আছে বিরাট ডাইনিং হল এবং ইনস্টিটিউটের বাগানসহ জায়গা-জমিও অনেকটা। আমাদের সকলকে প্রশিক্ষণের সুবিধার জন্য কয়েকটি রোপে ভাগ করে দেওয়া হল, প্রত্যেক রোপের জন্য একজন ইনস্ট্রাকটর বা শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। এঁদের আমরা 'সার' বলতাম। আমাদের সার ছিলেন রানা-সার।

কোর্স শুরু হওয়ার প্রথম দিন ভোর পাঁচটায় সবাই জমায়েত হলাম নিমের গেটের সামনে। এর পর শুরু হল জগিং বা দৌড়নো। দৌড়তে দৌড়তে পাহাড়ের অনেক নীচে যেখানে উত্তরকাশী শহর, সেখানে গিয়ে খোলা মাঠে কিছু ব্যায়াম করা, আবার দৌড়ে উপরে ওঠা। হাতেগোনা কয়েকজন মেয়ে ছাড়া, আমরা আর সকলেই ততক্ষণে হাঁফিয়ে পড়েছি। কিন্তু এ তো সবে শুরু। ইনস্টিটিউটে ফিরে ব্রেকফাস্ট সেরে আবার লাফানো-ঝাঁপানোর পালা। এবার কখনও জল-ভর্তি নালার উপর দিয়ে লাফ দেওয়া, কখনও বা দড়ির গাঁটে পা দিয়ে-দিয়ে উপরে ওঠা, কখনও আবার গাছে-টাঙানো দড়িতে ঝুলে হাত দিয়ে দড়ি ধরে দড়ির এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে পৌঁছনো। পাহাড়ি নদী পার হতে অনেক সময়ে এই পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। বলা বাহুল্য, এই সব শারীরিক কসরতের উদ্দেশ্য হল—পাহাড়ে ওঠার জন্য নিজের শরীরটাকে

একটু অবসর, তারই মাঝে অভিযানের নানা পরিকল্পনা

তৈরি করে নেওয়া, যাতে শরীরে বিন্দুমাত্র জড়তা না থাকে। এইসঙ্গে চাই সাহস। সাহসই পাহাড়ে চড়ার মূলকথা। রোপের সার নিজের দলের মেয়েদের শেখালেন কীভাবে নানারকম দড়ির গিঁট বাঁধতে হয়—যেমন রিফ নট, ফিশারম্যান্‌স্ নট, ক্লোভ হিচ্ ইত্যাদি। বিভিন্ন নট ছাড়াও, পাহাড়ে চড়া সম্বন্ধে আমরা নানা তথ্য জানলাম, যাকে বলা চলে পাহাড়ে চড়ার অ-আ-ক-খ। আমাদের এটাও বলা হল যে, এইসব 'থিয়োরিটিক্যাল' ক্লাসও মন দিয়ে করতে হবে, কারণ কোর্সের শেষে যখন 'এ', 'বি', 'সি' গ্রেড দেওয়া হবে তখন পাহাড়ে চড়ার দক্ষতাই শুধু নয়, থিয়োরির জ্ঞানও দেখা হবে।

পরের দিন শুরু হল সত্যিকারের পাহাড়ে চড়া। এর আগেই ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আমাদের রাকস্যাক, স্লিপিং ব্যাগ, পাহাড়ে চড়ার পোশাক, জুতো, দড়ি, আইস-অ্যাক্স ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এইসব ভারী রাকস্যাক কাঁধে নিয়ে ভোরবেলা সবাই বেরিয়ে পড়লাম। পায়ে হেঁটে কয়েক কিলোমিটার দূরে এক পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে আমাদের পাহাড়ে চড়া শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

প্রথম দিকে সহজ সব পাথরে চড়া শেখানো হল, যেগুলোতে দড়ির সাহায্য না নিয়ে খালি হাত ও পায়ের সাহায্যে ওঠা যায়। প্রথমেই শেখানো হয় থ্রি-পয়েন্ট হোল্ড। এ ছাড়া আমাদের শেখানো হল কোন পাথরের কোন খাঁজে পা রাখা যাবে, কীভাবে পাথরের গায়ের সঙ্গে নিজের দেহকে সমান্তরাল রেখে পাহাড়ে চড়তে হবে, ইত্যাদি।

ক্লাইম্বিং টেকনিক শেখার ফাঁকে-ফাঁকে চলছিল থিয়োরিটিক্যাল ক্লাসের পালা।

বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং-এর রক-ক্লাইম্বিং-এর এই পর্যায় চলে দিন চারেক। এতে পর্যায়ক্রমে সহজ থেকে কঠিন, নানা পদ্ধতিতে পাহাড়ে চড়া শেখানো হয়। সবই কোমরে বাঁধা দড়ির সাহায্যে পাহাড়ে ওঠা-নামা করা। কোনও অভিযাত্রী-দল যখন কোমরে বাঁধা দড়ির সাহায্যে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে এবং একের পর এক পাহাড়ের উপরে উঠতে থাকে, তখন যে-কোনও একজন ক্লাইম্বার কীভাবে তার পরবর্তী ক্লাইম্বারকে দড়ির সাহায্যে উঠতে সাহায্য করবে তা এই রিলে করার পদ্ধতি থেকে শেখা যায়। 'র‍্যাপেলিং' দূর থেকে বেশ বিপজ্জনক দেখতে লাগলেও, আসলে খাড়া পাহাড় থেকে চট করে নীচে নামার খুব সহজ পদ্ধতি এটি। মাটি থেকে প্রায় ৯০ ডিগ্রি কোণে উঠে যাওয়া পাহাড়ের গা বেয়েও র‍্যাপেলিং করা যায়।

এ ছাড়াও নতুন যা শিখেছিলাম, তা হল—নদী পার হওয়ার কৌশল। পাহাড়ি নদীতে নেমে ঠাণ্ডায় পা জমে যাচ্ছিল। কিন্তু উপায় নেই। লম্বা-লম্বা লাঠি দিয়ে কীভাবে জলের গভীরতা আন্দাজ করে ধীরে-ধীরে এগোতে হবে, লাঠি না থাকলে কীভাবে চার-পাঁচ জন হাত ধরে বা কোমর জড়িয়ে একসঙ্গে এগোবে, রাফ্‌ট-এর সাহায্যে কীভাবে জলে ভেসে থাকা যায়, এসব পদ্ধতি আমরা সেদিন শিখেছিলাম।

দেখতে দেখতে উত্তরকাশী-পর্যায়, প্রথম চার-পাঁচ দিনের রক-ক্লাইম্বিং শেখা শেষ হল। এবার বাসে করে আমরা চললাম হরসিলের উদ্দেশ্যে —সেখানে আরও দুর্লঙ্ঘ্য কিছু পাহাড়ে দু'দিনের রক-ক্লাইম্বিং শেখা হবে। হরসিল জায়গাটি ছোট্ট, উচ্চতা ৮৪০০ ফুট।

পরের দু'দিন হরসিলে কঠিন সব পাহাড়ে ওঠা অভ্যাস করলাম। ইতিমধ্যে পাহাড়ে ওঠার কৌশল ছাড়াও শিখলাম পাহাড়ে চড়তে গিয়ে কী-কী বিপদ ঘটতে পারে, কী অসুখ হতে পারে, সেসবের মোকাবিলা কীভাবে করতে হবে, ইত্যাদি।

এর পর রাকস্যাক গুছিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম গঙ্গানানির দিকে। গঙ্গানানির উচ্চতা ৩৫২০ মিটার। পৌঁছে রাকস্যাক নামিয়ে রেখে রোপ ইনস্ট্রাকটরের নির্দেশে সবাই লেগে গেলাম বড়-ছোট নানা মাপের পাথর কুড়োতে।প্রতিটি রোপের মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের তাঁবু খাটাবে তাই পাথরের জোগাড়। হাওয়ায় যাতে তাঁবুর চারপাশ না ওড়ে, সেজন্য তাঁবুর বাইরের অংশ যেটা মাটিতে ছড়ানো থাকে, ভারী-ভারী পাথর দিয়ে চাপা দেওয়া হয়। গঙ্গানানিতে কিছু শেখার জন্য আসা হয়নি, পরের গন্তব্যস্থলের পথে এটা হল্ট।

পরদিন ভোরবেলা তাঁবু গুটিয়ে ভার কাঁধে নিয়ে আবার হাঁটার শুরু। প্রতিদিনই চলা আরম্ভ করার সময় মনে হত, সারা গা-হাত-পায়ে এত ব্যথা নিয়ে এতটা পথ যাব কী করে। আবার একটু হাঁটলেই ব্যথাবেদনা আর গায়ে লাগত না। চলতে চলতে আমরা পৌঁছলাম এক সবুজ উন্মুক্ত প্রান্তরে। গোটা প্রান্তরকে ঘিরে আছে বরফে ঢাকা পাহাড়।

কিন্তু বরফের উপর হাঁটা যে কতটা কষ্টকর তা অল্প সময়েই আন্দাজ করলাম। বরফের পাহাড়ে চড়ার জন্য বুট দিয়ে বরফে আঘাত করে করে ওঠা শিখলাম। এ-ব্যাপারে আইস অ্যাক্সের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনমতো এর সাহায্যে উপরে চড়া যায়, বরফে এর উপর বসে বিশ্রাম নেওয়া যায়, বরফের ঢালে হঠাৎ পিছলে গড়িয়ে নীচে পড়তে থাকলে আইসঅ্যাক্স বরফে পুঁতে পতন রোধ করা যায়। এমনকী ইচ্ছে হলে আইসঅ্যাক্সকে স্কি-এর লাঠির মতো ব্যবহার করে বরফের ঢাল বেয়ে অনায়াসে স্কি করতে পারা যায়। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়লে রক্ষা করবে এই অ্যাক্স। কিয়ারকোটির তুষাররাজ্যে এ ছাড়াও শিখলাম বরফে রিলে করার পদ্ধতি। এবার মনে হতে লাগল যেন সত্যিকারের একজন মাউন্টেরিয়ার হয়ে উঠেছি। তখনও জানি না যে আসল মাউন্টেনিয়ার হওয়ার পথে আরও কত শেখার জিনিস অপেক্ষা করছে আমাদের

জন্য।

কিয়ারকোটিতে কয়েকদিন স্লো-ক্র্যাফ্‌ট্ অভ্যাস করার পর তাঁবু গুটিয়ে আবার রওনা হলাম। এবার আমাদের বেস ক্যাম্প-এর উদ্দেশ্যে। এটাই হবে আমাদের শেষ 'স্টপ'। কিয়ারকোটি থেকে খুব দূরে নয়, একটি পাহাড়ি নদীর পাশে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে আমাদের তাঁবু আবার ফেলা হল। নাম-না-জানা এই জায়গাটির উচ্চতা ৪০০০ মিটার অর্থাৎ সাড়ে- তেরো হাজার ফুটের একটু বেশি। জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে কিছু খেয়ে বেরিয়ে পড়তে হল আরও উঁচু পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। প্রায় দু'হাজার ফুট চড়াই অতিক্রম করে আবার পৌঁছলাম বরফের রাজ্যে। সেখানে সাদা বরফের সমুদ্রের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে আছে কিছু কালো কালো পাথরের দ্বীপ। সেই পাথরের চাঁইগুলো আমরা ব্যবহার করলাম বসে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। চারদিকে যতদূর চোখ যায় বরফে ঢাকা পাহাড় উঠে গেছে; একটু দূরে দেখি আরও উঁচু সব পাহাড়ের ঢালে আমাদের কয়েকজন ইনস্ট্রাকটর আইসঅ্যাক্স নিয়ে বরফের দেওয়ালে ঠোকাঠুকি করছেন। পরে শুনলাম সেখানে আমাদের আইসক্র্যাফ্‌ট্ শেখানো হবে—তারই জন্য পাহাড়ের ঢালের কিছু নুড়ি-পাথর সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা যে বরফ পেরিয়ে এসেছি, তা সবই নরম সাদা বরফ কিন্তু দূরে যা দেখছি, তা নীলাভ-সাদা শক্ত বরফ। সেই শক্ত বরফের দেওয়াল বেয়ে কীভাবে লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়, তাই শিখতে হবে এবার।

আইসক্র্যাফ্‌ট্ মোটামুটিভাবে রপ্ত হয়ে গেলে আমাদের শেষ দিন নিয়ে যাওয়া হল লমখাগা পাস অবধি। ৫২৮০ মিটার অর্থাৎ প্রায় ১৮০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই পাসে গিয়ে আবার বেস ক্যাম্পে ফিরে আসতে হবে, তাই খুব ভোরে সকলে রওনা হলাম। এই পাসে যাওয়ার রাস্তায় পাথুরে পাহাড়, উঁচুনিচু ও সমান্তরাল জমি, নদী, সুদৃশ্য হ্রদ, আবার বরফে ঢাকা পর্বতশৃঙ্গ—সবই পড়ে। বৈচিত্র্যময় এই পথ। আমাদের দলের সবাই পাস অবধি পৌঁছতে পারিনি বিভিন্ন কারণে—শারীরিক শক্তি সকলের সমান নয়, অসুস্থতাজনিত দুর্বলতাও ছিল অনেকের, কেউ হাঁটার পথে পায়ে চোট পায়, কারও আবার রোদ-চশমা না আনার দরুন প্রচণ্ড রোদের মধ্যে বরফে চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমি নিজে ১৭০০ ফুট উচ্চতার পর আর উঠতে পারিনি।

পাহাড়ের উঁচুতে চড়বার সময়ে ক্লাইম্যাটাইজ করে নিতে হয়, অর্থাৎ উঁচু জায়গার কম অক্সিজেন, তার নিজস্ব জলবায়ুর সঙ্গে শরীরকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়।

এবার বেস ক্যাম্পের একটা মজার গল্প বলি। যখন বেস ক্যাম্পে আস্তানা গেড়েছি আমরা, তখন জুন মাস, কলকাতায় সকলে দরদর করে ঘামছে। সেই সময় বেস ক্যাম্পে একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি চতুর্দিক সাদায় সাদা। চারদিক অন্যরকম লাগছে, অন্য তাঁবুতে যাওয়ার পথ চিনতে অসুবিধে হচ্ছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, তাঁবুর মাথাটা দেখি অনেকখানি নীচে নুয়ে পড়েছে। বরফের ভারে। আমরা তখন তাঁবুর ভিতর থেকে লাঠি দিয়ে ঠেলে ঠেলে সেই বরফ ঝাড়লাম, তাঁবুর মাথাটা একটু হাল্কা হল।

লমখাগা পাস অভিযানের পর এবার উত্তরকাশী ফেরার পালা। যে পথে আগে দেখে গেছি শুধু সবুজের সমারোহ, ফেরার পথে সেই একই পথ দেখি নানা ফুলে ঢাকা, হয়তো আমাদের জন্যই প্রকৃতির এই উপহার।